গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য, প্রবীণ জননেতা

কমরেড সি কে লুকোসের জীবনাবসান

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর বিশিষ্ট সদস্য কমরেড সি কে লুকোসের প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন করে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ ফেব্রুয়ারি এক শোকবার্তায় বলেন,

দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সি কে লুকোস ১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিরুবনন্তপুরমের হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু শুধু বেদনাদায়কই নয়, আমাদের কাছে এক গুরুতর আঘাত। এই বিপ্লবী নেতার প্রয়াণে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে।

১৯৬০-এর দশকে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কমরেড সি কে লুকোস কেরালায় দল গড়ে তোলার কাজে

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে গ্রাহক সম্মেলন

তমলুক

তমলুক ঃ বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র তমলুক শাখা সম্মেলন ১৬ ফেব্রুয়ারি উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মা বারোয়ারি ভবনে। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মহাদেব সামন্ত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার জেলা সভাপতি জয়মোহন পাল, জেলা সম্পাদক শংকর মালাকার, রবীন্দ্রনাথ বেরা, অনিল সামন্ত প্রমুখ। সম্মেলন উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবির ও ফ্রি সুগার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

মহাদেব সামন্তকে সভাপতি, আশীষ দে কে সম্পাদক করে ২৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী কয়লার দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানো, জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী-২০১৮ বাতিলের দাবিতে ১৯ মার্চ কলকাতার বিদ্যুৎ ভবন অভিযান সফল করার জন্য আহ্বান জানান। সমগ্র কর্মসূচি পরিচালনা করেন প্রণব মাইতি।

ভগবানগোলা ঃ ১০ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ১ ও ২ নং ব্লকের দেড়-শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অ্যাবেকার সপ্তম ভগবানগোলা আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শ্যামপুর গুঁড়িপাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে। উপস্থিত ছিলেন ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সাজ্জাদ আলি, অ্যাবেকার সহ-সভাপতি কুণাল বিশ্বাস, জেলা সভাপতি বাপি ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস ও জেলা সহ-সভাপতি মইনুদ্দিন সরকার। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক জয়চাঁদ মণ্ডল। বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বকেয়ার উপর এলপিএসসি মকুব, কৃষিতে বিনামূল্যে এবং গৃহস্থ-ক্ষুদ্রশিল্প-ক্ষুদ্র ব্যবসাতে ২ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি দাবিতে ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানে মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জহরলাল পালকে সভাপতি, ইস্তাক আহমেদকে কোষাধ্যক্ষ এবং আব্দুর রউফকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৩ জনের শক্তিশালী নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

ভগবানগোলা

এ বছর থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে
জেলায় জেলায় সেভ এডুকেশন কমিটি আন্দোলনে

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, রাজ্যগুলি চাইলে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে পারে। সেইমতো ওড়িশা সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু টালবাহানা করে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক) কাছে ডেপুটেশন দিল অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মনোজ গুহ, জেলা সম্পাদক জয়দেব জাতুয়া, সহ সভাপতি কনক কান্তি হালদার, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পঞ্চানন ময়রা ও অধ্যাপক সোমা রায়। পাশ-ফেল চালু ছাড়াও শিক্ষার সর্বস্তরে স্বাধিকার রক্ষার দাবি জানানো হয়। ডি আই দাবিপত্র দ্রুত শিক্ষা দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

বাঁকুড়া ঃ অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি বাঁকুড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, বৈজ্ঞানিক সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল করা বন্ধ করা ইত্যাদি দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। নেতৃত্ব দেন নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস, অসিত মণ্ডল, বিষ্ণু রক্ষিত, স্বপন গরাই প্রমুখ।

এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ডি আই দপ্তরে সেভ এডুকেশন কমিটির অবস্থান ও বিক্ষোভ।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় মথুরাপুর থানার দেবীপুর অঞ্চলে প্রবীণ এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড পৃথ্বীশ কর ৯২ বছর বয়সে ১৮ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে আনা হলে দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ দলের রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্যরা এবং গণসংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন শ্রদ্ধা জানান। গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের শেষের দিকে তাঁর দাদা কমরেড প্রতুল করের মাধ্যমে তিনি দলের কর্মীতে পরিণত হন এবং পরবর্তীকালে দেবীপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক হিসাবে দলের কাজ পরিচালনা করেন। একসময় সরকারি উচ্চপদে কাজ করা সত্ত্বেও গরিব মানুষের সাথে মেলামেশায় তিনি নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলেন। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, স্কুল-ক্লাব গঠনে ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তাঁর উজ্জ্বল ও সফল ভূমিকা ছিল। সদালাপী ও উদারমনস্ক হিসাবে গ্রামের মানুষ আপনজন হিসাবে গণ্য করে তাঁকে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত করেন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বচ্ছভাবে সে কাজ তিনি করেছেন। নানাবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর সাথে সাথে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবি ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। দলের 'অভিযান প্রেস' নিষ্ঠার সাথে কয়েক বছর পরিচালনা করেছেন। গত কয়েক বছর রোগভোগের মধ্যেও দলের খোঁজ-খবর রাখতেন, দলের পত্র-পত্রিকা পড়তেন এবং তরুণ কমরেডদের কাজে উৎসাহ দিতেন।

৩ ফেব্রুয়ারি কমরেড মালব রায়ের সভাপতিত্বে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস মাদার নস্কর, নন্দ কুণ্ডু সহ জেলা কমিটির সদস্যরা, গ্রামবাসী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড পৃথ্বীশ কর লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জি প্লটে দলের যুব কর্মী কমরেড সুজয় দাস দূরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ৮ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পারিবারিক সূত্রে ছাত্রাবস্থাতেই ডি এস ও-র সাথে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। পারিবারিক অভাব অনটনের মধ্যে ছাত্রজীবন বেশি দূর না এগোলেও পরবর্তীকালে যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও গড়ে তোলার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ২০১৭ সালে নতুন জায়গায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তাঁর ভূমিকা সহকর্মীদের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে। দ্বীপাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় কাজ করতে করতে তিনি সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তারপরেই সেই মর্মান্তিক সংবাদ আসে— কমরেড সুজয় দাস শিরদাঁড়ার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এবং তা শেষ পর্যায়ে।

চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত একজন কমরেড যেভাবে জীবন পরিচালনা করেছেন, তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। অনারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত জেনেও তাঁকে দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। কমরেডরা সহমর্মিতা জানাতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই ফিরেছেন। শরীরের যন্ত্রণার কথা জানতে চাইলে তিনি একমুখ হেসে সংগঠনের কথাই জানতে চাইতেন। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও প্রতি মুহূর্তে সংগঠন বিস্তারের ব্যাপারে কমরেডদের কাছে নানা পরিকল্পনা ও মতামত দিতেন।

মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর জ্ঞান চর্চার আকুতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্ত্রীকে দিয়ে দলের নানা পত্রিকা, বই পড়াতেন। তাঁর কাছে পাড়া-প্রতিবেশী-শুভানুধ্যায়ীরা যখনই এসেছেন, দেখেছেন তাঁর বালিশের পাশে একটা পেন আর ডি ওয়াই ও-র সদস্য পত্র রয়েছে। শিরদাঁড়ার যন্ত্রণায় সুজয় বসে থাকতে না পারলে শুয়ে শুয়েই তাঁদের দিয়ে সদস্যপদ পূরণ করিয়েছেন ও সংগ্রামী তহবিলে অর্থ সাহায্যও নিয়েছেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদককে জানিয়েছেন, —'আমি তো পারলাম না, অন্যরা যাতে পারে আপনি দেখবেন'। এই রকম বিরল বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী কমরেড সুজয় দাসের মৃত্যু যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতি। দলও এক অমূল্য সম্পদকে হারাল।

৮-৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় দলের রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা চলাকালীন এই মর্মান্তিক খবর আসে। সভায় কমরেড সুজয় দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি জি প্লটে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড সুজয় দাস লাল সেলাম

ভাঙছে পরিবার, বাড়ছে মৃত্যু

রাজ্যে অবিলম্বে মদ নিষিদ্ধ করার ডাক

১৫ মার্চ রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

ঘটনা-১ ঃ খিদিরপুরের কয়লা ডিপো বস্তির ছয় বছরের ছোট্ট পরি বাবাকে বলেছিল, "মদ খাও, আর আমাকে স্কুলে দিতে পার না?" নেশাগ্রস্ত বাবা মেয়ের এই প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। 'ছোট মুখে বড় কথা'— গর্জাতে গর্জাতে মেয়েকে তুলে আছাড় মারে। মৃত্যু হয় নিষ্পাপ শিশু পরির।

মদের নেশা পরিবারটির অর্ধেক ভেঙেছিল আগেই। মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে শিশুটির মা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এবার মাতৃহারা শিশুটির মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাবার হাতেই।

ঘটনা-২ ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনির তেঁতুলিয়া গ্রামে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মালা সোরেনের স্বপ্ন— পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষিত হবে। কিন্তু বাধা মদ্যপ বাবা। মেয়ের কথায়— 'বাবা নেশা করলেই অন্য মানুষ হয়ে যায়, পড়তে দেখলে তেড়ে আসে, বইপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়।' পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে মালা।

ঘটনা-৩ ঃ উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ— দুই বিজেপি শাসিত রাজ্য। ১০ ফেব্রুয়ারি সংবাদে প্রকাশ, উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার এবং উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে তিন দিনে বিষমদে প্রাণ হারিয়েছে ৭০ জন।

এমন অসংখ্য ঘটনা প্রতিদিন রাজ্যে-রাজ্যে, জেলায় জেলায় ঘটে চলেছে। গত ডিসেম্বরে নদিয়া জেলায় বিষ মদে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই জেলার কৃষ্ণনগরে ২০০২ সালে সিপিএম জমানায় বিষ মদে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৯ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় তমলুকের রামতারকে বিষমদে মৃত্যু হয়েছিল ৪৮ জনের। বিষমদে মৃত্যুর ধারা সিপিএম আমল থেকে তৃণমূল আমল —একইভাবে অব্যাহত। ২০১১ সালে তৃণমূল শাসনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে বিষমদে মৃত্যু হয় ১৭৩ জনের। ২০১৩ সালে বীরভূমের তারাপীঠে ৮ জন এবং ২০১৫ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিষমদে মৃত্যু হয় ২৫ জনের।

তমলুকের হোগলবেড়িয়া এলাকায় তিনটি সরকারি মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ। ১৬ ফেব্রুয়ারি

শুধু কি সরাসরি মৃত্যু? মদের পরোক্ষ প্রভাবে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির বহরও কি কম? এত যে পথদুর্ঘটনা হচ্ছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে তার পিছনেও রয়েছে চালকদের মদের নেশা। সরকার 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফে'র কথা বলে। অথচ 'লাইফ সেভ' করতে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। হোর্ডিং-এ লেখা 'সেফ লাইফ' জীবন বাঁচাও, কিন্তু কাজে দাঁড়াচ্ছে 'ডেসট্রয় লাইফ' জীবন ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। রাজ্যে নারী নির্যাতন মারাত্মক আকার নিয়েছে। অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এইসব ঘটনার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধীরা মদ্যপ অবস্থায় থাকে। অথচ সরকারি উদ্যোগেই মদের প্রসার ঘটছে হু হু করে।

২০১৮ সালে তৃণমূল সরকার ঘোষণা করেছে, ১২০০-র বেশি মদের দোকানের লাইসেন্স দেবে। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে না পারলেও একটি করে মদের দোকান খোলার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। জাতীয় সড়কের ৫০০ মিটারের মধ্যে মদের দোকান খোলা যাবে না, হাইকোর্ট এই রায় দিলেও সরকার আইনের প্যাঁচ কষে তা এড়িয়ে যাচ্ছে। সরকারের এই নীতির ফলে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাও মদে আসক্ত হয়ে পড়ছে। সরকারের মদের ঢালাও প্রসারের নীতি সমাজ-মনুষ্যত্বের প্রতি এক গভীর ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

'মানুষের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি'— এ সব কথা সরকারের কাছে মূল্যহীন। মানুষগুলি তো সরকারের কাছে এক একটা ভোটের সংখ্যা মাত্র। ভোট শেষ হলেই তার প্রয়োজনীয়তাও শেষ। তারপর সারা বছর ধরে চলে নাগরিক জীবন ছারখার করে দেওয়ার রকমারি আয়োজন। সবই চলে রাজস্বের নামে। রাজস্ব বৃদ্ধির কথা বলে মানুষকে বোকা বানাতে চায় সরকার। তাই রাজকোষ অপচয় বন্ধ করার কোনও আয়োজন নেই। রাজকোষের টাকা দিয়ে দান খয়রাতির মারফৎ ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করার হীন রাজনীতি চলে। আর সেই রাজকোষ ঘাটতি মেটানোর অজুহাত দিয়ে জনজীবন বিপন্ন করে সরকার খোলে অসংখ্য মদের দোকান, পানশালা। চালু করে নানা লটারি। সেই লটারিতে শত শত পরিবার সর্বস্বান্ত হলেও সরকারের কোনও উদ্বেগ নেই।

রাজস্ব না হলে উন্নয়ন হবে কী করে? সরকারের এ হেন কুযুক্তিতে বিভ্রান্ত হয় কেউ কেউ। কিন্তু প্রশ্ন হল, নাগরিক জীবন বিপন্ন করে কার উন্নয়ন করতে চায় সরকার? মদের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে মানুষের উন্নয়ন করা যায়? সরকার সত্যিই উন্নয়ন করতে চাইলে, সরকারি চুরি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অপচয় বন্ধ করত, এমএলএ-এমপিদের অত্যধিক সুবিধা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করত, পুঁজিপতি-শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের ট্যাক্স ছাড় দেওয়া বন্ধ করত, বিত্তবানদের উপর উন্নয়ন ট্যাক্স ধার্য করত। কিন্তু এ সব কোনও কিছু না করে সরকার মদ, লটারি, জুয়া-সাট্টার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। তা হলে সরকারের উদ্দেশ্য কী? উন্নয়নের বাহানায় মানুষের, বিশেষত যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য— যাতে সুস্থ মানুষ হিসাবে তারা গড়ে উঠতে না পারে, সরকারি দলগুলির ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি, জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরোধিতা করতে না পারে, প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে। জনদরদের মুখোশ পরেই সরকার এই কাজ করছে। যে দল যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে তারা সেখানে একই কাজ করছে। এ ব্যাপারে তৃণমূল সিপিএম বিজেপি কংগ্রেসে কোনও ফারাক নেই।

মদের প্রসার নীতিতে তৃণমূল সরকার পূর্বতন সিপিএম সরকারেরই পথ অনুসরণ করছে। ২০০৫ সালে সিপিএম সরকার সারা রাজ্যে ১৪০০ নতুন মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিয়েছিল। ২০১৮ সালে তৃণমূল সরকার আরও ১২০০-র বেশি মদের দোকান খোলার কথা ঘোষণা করে। রাজ্য সরকারি সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস করপোরেশন লিমিটেড (বেভকো)-র হিসাবে সারা রাজ্যে বর্তমানে বিলাতি মদের দোকান ও পানশালা রয়েছে ৫,৩০০টি। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে প্রবল গণবিক্ষোভে সরকার মদ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এ রাজ্যে আরও নতুন মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিচ্ছে। সমীক্ষার তথ্য বলছে, বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।

আশার কথা, রাজ্যের মানুষ সরকারের এই সর্বনাশা নীতি চুপচাপ মেনে নিচ্ছে না। নিজেদের সন্তানকে বাঁচাতে, পরিবার বাঁচাতে, সমাজকে বাঁচাতে সর্বত্র সোচ্চার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদ আন্দোলনে এগিয়ে আসছেন দলে দলে মহিলা। ভুক্তভোগীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ফল না হলে নিজেরাই দোকান উচ্ছেদ করছেন। ঘোষণা করছেন, এলাকায় কোনও মদের দোকান খুলতে দেওয়া হবে না— যে কোনও মূল্যে আমরা তা প্রতিরোধ করব। মহিলারা এই আন্দোলনের সামনের সারিতে। কারণ মদের কুফল তাঁদের উপরই বর্তায় বেশি। রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। কত বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। মদ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রাম ব্লকের সরডিহা গ্রামে উদ্বোধন হয় 'জঙ্গলমহল লিকার শপ' নামে একটি মদের দোকান। কয়েক দিনের মধ্যেই এলাকার মহিলাদের প্রবল বিক্ষোভে দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয় মালিক। একই ভাবে জয়নগর ২ নং ব্লকের মায়াহাউড়ি অঞ্চলের ঘোষালের চক গ্রামে মদের দোকান খুললে এলাকার মহিলারা ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভে নামেন এবং দোকান বন্ধ করে দেন। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, স্কুল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই মদের দোকান। এই দোকান চালু হলে এলাকায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। পড়ুয়াদের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। এই রকম নানা আশঙ্কা থেকেই জেলায় জেলায় ইতিমধ্যে মহিলারা মদের বিরুদ্ধে সামিল হয়েছেন। মগরাহাট থানার গোকর্ণী, তসরালাতে মহিলারা মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে লাঠি হাতে বিক্ষোভ দেখিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর, দুই মেদিনীপুর সহ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে মদবিরোধী আন্দোলন।

মদের প্রসারে পরিবার ভাঙছে, মরছে মানুষ। সরকার তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। মদের প্রসারের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) ১৫ মার্চ সারা রাজ্যে জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে সব স্তরের সাধারণ মানুষকে তাতে যোগ দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

শিক্ষায় ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাই কেন্দ্রীয় বাজেটে

বিজেপির কাছে মানবসম্পদের চেয়ে গো-সম্পদের মূল্যই যে বেশি তার প্রমাণ এবারের বাজেটের ছত্রে ছত্রে।

বিজেপি সরকার রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন, রাষ্ট্রীয় কামধেনু আয়োগ অর্থাৎ গরু কল্যাণ প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আই আই এম)-এ বরাদ্দ কমেছে ৫৯.৯ শতাংশ। টাকার অঙ্কে ১,০৩৬ কোটি টাকা থেকে কমে হয়েছে ৪১৫.৪১ কোটি টাকা। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আই আই টি)-গুলোর জন্য যেখানে ২০১৮-'১৯ সালে ৬,৩২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, তা কমে হয়েছে ৬,২২৩.০২কোটি টাকা।

এটাই শুধু প্রথমবার নয়, দেশের এই শীর্ষ স্থানীয় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনের জন্য এর আগেও বাজেটে বরাদ্দ ছাঁটাই হয়েছে। ২০১৭-'১৮ সালের বরাদ্দ ৮,৩৩৭.২১ কোটি টাকা, ২০১৮-'১৯ সালে কমে হয়েছে ৬,৩২৬ কোটি টাকা। এ ছাড়াও ইউজিসি/এ আইসিটিই-র মতো সংস্থা উচ্চশিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সে ক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

ইউ জি সি-র ক্ষেত্রে ২০১৮-'১৯ সালে বাজেটে যেখানে ৪, ৭২২.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, বর্তমানে তা কমে হয়েছে ৪,৬০০.৬৬ কোটি টাকা। এ আই সি টি ই-র ক্ষেত্রেও ২০১৮-'১৯ সালে ৪৮৫ কোটি টাকা থেকে কমে হয়েছে ৪৬৬ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে সমগ্র বাজেটের অতি সামান্য—৩.৪৮ শতাংশ এতদিন যা খরচ হত শিক্ষা খাতে, এবার তা আরও কমে দাঁড়িয়েছে—৩.৩ শতাংশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ভাবে শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ কমানোর ফলে স্কুল স্তর থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে শিক্ষা ব্যবস্থা। বহু স্কুলের বিল্ডিং নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, শৌচালয় পর্যাপ্ত নেই। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। কলেজগুলিতেও একই অবস্থা। সামান্য পাশ কোর্সে ভর্তির জন্য হাজার হাজার টাকা গুনতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। বাড়তি টাকা খরচ করে পড়তে হচ্ছে, যার গালভরা নাম 'সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্স'। গবেষণা ক্ষেত্রে অনুদান পর্যাপ্ত নয়। ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়েছে ইউ জি সি-র মতো সংস্থাকে তুলে দেওয়া হবে। সম্প্রতি সিএজি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, গত ২০০০-'০৭ সাল পর্যন্ত নানা পণ্য ও পরিষেবা থেকে আদায় হওয়া এডুকেশন সেস বাবদ ৮৩, ৪৯৭ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে খরচ করা হয়নি।

মোদি সরকারের এই শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন ডিএসও। ডিএসও দাবি করেছে শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ এবং রাজ্য বাজেটের ৩০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে হবে।

চিটফান্ড ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপম চৌধুরী বলেন, সামগ্রিক চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে সেবি, ইডি, রাজ্য সরকার ও কোম্পানিগুলো হাইকোর্ট নিয়োজিত কমিশনকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিগত ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলা দেশের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি নিয়ে উপরোক্ত সংস্থাগুলি এ রাজ্যে ও সারা দেশে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং কত পরিমাণ টাকা এরা জনগণ থেকে তুলেছে তার প্রকৃত তথ্য পেশ করেনি। আমরা সাংবাদিকদের অবগতির জন্য তথ্যগুলি দিয়েছি। এগুলি প্রাথমিক তথ্য। ভবিষ্যতে আরও তথ্য দেব। সেবি দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন তৎপর হল না তার তদন্ত দাবি করছি। পত্রপত্রিকায় ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার ম্যাচিওরিটি হওয়া সার্টিফিকেট আমানতকারীদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের সাদা কাগজে রিসিভিং স্লিপ দেওয়া হয়েছে। এটাও আর একটা প্রতারণা। আমরা এরও তদন্ত চাইছি। সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, কর্পোরেট মন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। ওই কপি মুখ্যমন্ত্রীকেও পাঠানো হয়েছে।

পরবর্তী কর্মসূচি ঃ অঞ্চলপ্রধান, সভাপতি, সভাধিপতি, জেলা পরিষদ, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কর্পোরেশনের মেয়রদের স্মারকলিপি দেওয়া হবে। একইভাবে এমএলএ-এমপি দের স্মারকলিপি দেওয়া হবে। এরই সাথে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ব্লক, থানা, মহকুমা, জেলাস্তরে ডেপুটেশন, কনভেনশন সংগঠিত হবে। আগামী ২ মার্চ রাজ্য স্তরে জনশুনানির কর্মসূচি হবে। মাননীয় প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই শুনানি পরিচালনা করবেন।

নন্দীগ্রামে দর্জি শ্রমিক সম্মেলন

দর্জি শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, অসংগঠিত শ্রমিকের পরিচয়পত্র প্রদান, কাজের ব্যবস্থা, স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ-এর দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা দর্জি ইউনিয়নের নন্দীগ্রাম থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক দর্জি শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের রাজ্য নেতা নন্দ পাত্র বলেন, দর্জি শ্রমিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাদের জীবন কাটে অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই অবস্থা থেকে বের হতে হলে সংগঠিত হয়ে ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা নেতা চন্দ্রমোহন মানিক। শেখ আকসারকে সভাপতি, শেখ মুজাফফর এবং বিমল মাইতিকে যুগ্ম সম্পাদক ও প্রলয় খাটুয়াকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

পরিচারিকাদের সন্তানদের শীতবস্ত্র বিতরণ

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি পুরুলিয়া জেলায় পরিচারিকাদের সন্তানদের শীতের প্রবল ঠাণ্ডা থেকে কিছুটা রেহাই দিতে শীতবস্ত্র প্রদান করে। ১০ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির দেশবন্ধু রোড এলাকায় শতাধিক পরিচারিকা মায়ের সন্তানদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া শহরের ১ নং ওয়ার্ডের মুনসেফডাঙায় একই ভাবে শতাধিক পরিচারিকা মায়ের সন্তানদের শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। সমিতির জেলা সম্পাদিকা শোভা মাহাতো কর্মসূচি পরিচালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল।

আন্দোলনের চাপে বর্ধিত ফি ফিরিয়ে দিল স্কুল

রায়দিঘি যোগেন্দ্রপুর হাইস্কুলে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র-অভিভাবকদের বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘিতে যোগেন্দ্রপুর হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি ফি হিসাবে ৪০০-৪৫০ টাকা আদায় করে। প্রতিবাদে এআইডিএসও এবং ছাত্র-অভিভাবক কমিটির নেতৃত্বে পাঁচশোরও বেশি ছাত্র-অভিভাবক ৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখেন। আন্দোলনের চাপে প্রধান শিক্ষক ঘোষণা করেন, ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাড়তি ফি ফেরৎ দেওয়া হবে। আন্দোলনের এই জয় এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে। ডিএসও এবং ছাত্র-অভিভাবক কমিটির পক্ষ থেকে যথাক্রমে জেলা কমিটির সদস্য বাবলু মণ্ডল ও সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা প্রতিবাদী ছাত্র ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানান।

পুলিশি হামলা সত্ত্বেও ফ্রান্সে বিক্ষোভ চলছেই

ফ্রান্সের বৃহত্তম বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ‘কনফেডারেশন জেনেরালে দু ট্রাভায়েল’ (সিজিটি) এবার ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনকারীদের পাশে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের রাজপথে পায়ে পা মিলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা।

তিন মাস ধরে ফ্রান্সে লাগাতার চলছে ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলন। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত নভেম্বরে প্রথম পথে নেমেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। ট্রাকচালকদের পোশাকের অনুকরণে তাঁদের পরনে হলুদ রঙের জ্যাকেট, যা থেকে এই আন্দোলনের নাম দাঁড়িয়ে যায় ‘ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলন’। দিনে দিনে জনজীবনের আরও নানা দাবি যুক্ত হয়েছে তাঁদের আন্দোলনে। দাবি উঠেছে ন্যূনতম মজুরি ২০ শতাংশ বাড়াতে হবে, আনতে হবে নারী-পুরুষের মজুরিতে সমতা। সরকারি পরিষেবার সুযোগ বাড়ানোর দাবিও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিচিত কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা দলকে দেখা যায়নি। সাধারণ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে নেতৃত্ব। তাঁরা এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গড়ে লড়াই সংগঠিত করে চলেছেন। ব্যাপক পুলিশি হামলা সত্ত্বেও আন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে নড়েননি ফ্রান্সের বিক্ষুব্ধ মানুষ।

ইতিমধ্যে জনবিক্ষোভে লাগাম টানতে আঞ্চলিক সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা তুলে দিতে পার্লামেন্টে একটি কালা বিল পেশ করেছেন পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থবাহী সাংসদরা। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মহান স্লোগান তোলা ফরাসি বিপ্লবের দেশে এ হেন দমনমূলক আইন আনার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে সেখানকার সাধারণ মানুষ। তাই আন্দোলনের চাপে প্রেসিডেন্ট মাকরঁ কিছু কিছু দাবি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও সমস্যায় জেরবার দরিদ্র, মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী, পেনশনভোগী, বেকার, ছোট ব্যবসায়ীরা আজও আন্দোলনের পথে।

কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী মাকরঁ সরকারের পুলিশের হামলায় ইতিমধ্যে দশ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পিছু হঠতে রাজি নন ফ্রান্সের মানুষ। এ দিনের বিক্ষোভেও পুলিশ ব্যাপক হামলা চালায়। সিজিটি-র পক্ষ থেকে ওই দিন দেশজোড়া ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

উত্তরপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি)। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে যে বিক্ষোভ সভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রবীণকুমার শুক্লা এবং সঞ্চালনা করেন কমরেড জয়নারায়ণ মৌর্য। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জগদীশচন্দ্র অস্থানা।

সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র জেলাশাসককে প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমরেডস মিথিলেশ কুমার মৌর্য, দিলীপ কুমার খরওয়ার, মহেন্দ্র কুমার মৌর্য, জয়প্রকাশ পাণ্ডে, অশোক কুমার খরওয়ার প্রমুখ।

দলের কিশোর সংগঠন কমসোমলের উদ্যোগে ৩ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ব্লকের অটলে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, পিটি, প্যারেড শেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জয় লোধ, ডিএসও-র জেলা সভাপতি কমরেড কল্লোল বাগচী এবং জেলা কমসোমল ইনচার্জ কমরেড সৌরভ মহন্ত। ক্যাম্পে ৪৫ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

শ্রমজীবী জনগণের প্রিয় নেতা কমরেড সি কে লুকোস

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য এবং পূর্বতন কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারি তিরুবনন্তপুরমের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে কোল্লামে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র থাকাকালীন তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময় থেকেই তিনি কেরালায় দলকে সংগঠিত করার সংগ্রামের পুরোভাগে থেকেছেন। এ জন্য কষ্টসাধ্য সংগ্রামকে তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। কেরালায় দল গঠনের সূচনা পর্বে অগ্রণী সংগঠক কমরেড ভি নটরাজনের আকস্মিক মৃত্যুতে যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতিক্রম করার সংগ্রামে কমরেড সি কে লুকোস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কমরেড লুকোস দীর্ঘদিন কোল্লাম জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

শেষ যাত্রার আগে কমরেড লুকোসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেডস সৌমেন বসু, কে রাধাকৃষ্ণ সহ কেরালা রাজ্য নেতৃবৃন্দ

১৯৮৮ সালে কেরালার প্রথম রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। দলের অভ্যন্তরে যৌথতা গড়ে তোলা এবং দলকে সুসংবদ্ধ সংগঠনে পরিণত করার কাজে তাঁর নেতৃত্ব অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। কমরেডদের আদর্শগত চেতনার মান উন্নত করা এবং তাকে দৃঢ় আদর্শগত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে নিরন্তর আলাপ-আলোচনা করতেন। অত্যন্ত যত্নের সাথে তিনি অসংখ্য পার্টি কমরেডকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করার পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের অনেককে যোগ্য সংগঠকে পরিণত হতে সাহায্য করেছেন। দল, শ্রেণিসংগঠন ও গণসংগঠন গড়ে তোলার জন্য তিনি নিরলসভাবে কেরালা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরেছেন। তাঁর এই গতিশীল এবং উদ্যমী নেতৃত্ব কেরালার সর্বত্র সংগঠন বিস্তারে সাহায্য করেছে।

বিপ্লবী শ্রমিক ইউনিয়ন এ আই ইউ টি ইউ সি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড লুকোসের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি এই সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি এবং কেরালা রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলেন। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কেরালায় 'জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি' নামে গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান তিনি তুলে ধরেন। বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের মতো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই কমিটির নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কেরালার গণআন্দোলনে এই গণকমিটি এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। এর মধ্য দিয়ে বহু আন্দোলনে জয় অর্জিত হয়। পার্টির শক্তিবৃদ্ধিতে এই আন্দোলন ব্যাপক অবদান রেখেছে।

কমরেড লুকোস উন্নত মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতেন। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যভিত্তিক শিশুশিবির করা এবং তার যথাযথ পরিচর্যার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিশু শিবিরগুলিতে এক সময়ের অংশগ্রহণকারী বহুজন আজ দলের সর্বক্ষণের সংগঠক। ২৫ বছর আগে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের সাফল্যের সাক্ষ্য এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

তিনি তামিলনাড়ুতে দলের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। সেখানেও তাঁর উপদেশ ও সাহায্য ওই রাজ্যে পার্টির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে তাঁর চলাফেরা যখন প্রায় রুদ্ধ সেই সময়েও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বিষয় এবং কাজকর্ম পরিচালনায় তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। অসুস্থতার মধ্যেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে চিন্তার যে স্বচ্ছতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন, তা দলের নেতা-কর্মীদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে ভারতের সর্বহারা শ্রেণি এক বিশিষ্ট নেতাকে হারাল।

১৭ ফেব্রুয়ারি তিরুবনন্তপুরমের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

একের পাতার পর

পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দল গড়ার এই সংগ্রামে একদিকে তিনি যেমন কঠিন পরিশ্রম করেছেন, পাশাপাশি নিজের জীবনকে শ্রেণি, দল ও বিপ্লবের সাথে একাত্ম করার জন্য আদর্শগত সংগ্রামও চালিয়েছেন। সমগ্র কেরালা জুড়ে দারিদ্রপীড়িত জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণির অসংখ্য আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছেন এবং পরিচালনা করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের প্রিয় নেতায় পরিণত হন। ১৯৮৮ সালে কেরালায় দলের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পরবর্তীতে পলিটবুরো সদস্য হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে

স্মরণসভা

শরৎ সদন, হাওড়া ● ২৫ ফেব্রুয়ারি, বেলা ২টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

কমরেড সি কে লুকোসের বিপ্লবী চরিত্রের গুণাবলি এবং দল ও জনগণের স্বার্থে তাঁর অবদানকে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। এমনকী যে সময় পারকিনসন রোগ তাঁর চলৎশক্তি এবং কথা বলার ক্ষমতাকেও ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছিল, তখনও তাঁর চিন্তার শক্তি ও মানসিক বল অটুট ছিল, যার জোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিপ্লবী আদর্শের উচ্চমান, কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তাঁর প্রয়াণে শুধু কেরালা নয়, ক্ষতি হল সমগ্র দেশের শোষিত মানুষের। তাঁর অবিস্মরণীয় বিপ্লবী সংগ্রাম এবং নিষ্ঠা সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণকারী সকলের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কমরেড সি কে লুকোস লাল সেলাম

পাঠকের মতামত

আমরা যখন মিছিলের মুখ

৩০ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির তরফ থেকে এক মহামিছিলের আহ্বান জানানো হয়েছিল বাংলার সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে। সেই ঐতিহাসিক মিছিলে ঘটনাচক্রে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে পত্রকারের।

হেদুয়া পার্কে পৌঁছতেই মহানগরীর জনঅরণ্যের ক্যানভাস বদলে গেল জনসমুদ্রে। সমুদ্রতটের ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো হেদুয়া পার্কের সামনে স্বল্প পরিসর রাস্তায় আনাগোনা করছে ছোট বড় লম্বা বেঁটে নানা বয়সের নানা আকৃতির মানুষ। এই জনসমুদ্রের আচরণে চট করে যেটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হল এক প্রচ্ছন্ন শৃঙ্খলাবোধ ও সৌজন্যমূলক আচরণের পরিবেশ। সকলের মুখেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সপ্রতিভ হাসি, বিভিন্ন দিক থেকে যাঁরা মিছিল প্রাঙ্গণে উপনীত হচ্ছেন তাঁদের সাদরে জনসমুদ্রে অভ্যর্থনা জানানোর দেহভঙ্গি।

সম্প্রতি ঘটনাচক্রে সর্বহারার মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির মেডিকেল ফ্রন্টের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। অবাক চোখে লক্ষ করেছি, হাসপাতালের দায়িত্ব, পার্টির কাজ, কমিউন লাইফ কী অবলীলায় যাপন করেন তাঁরা। এই সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের মাঝেও নবীনতম কমরেডদের প্রতি তাঁদের স্নেহদৃষ্টি সর্বক্ষণ সজাগ। এমনই একজন সিনিয়র দাদার অনুরোধে মহামিছিলে অংশগ্রহণ করতে হেদুয়া পার্কে পৌঁছেছিলাম।

আমরা যারা শহুরে মধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত পরিশীলিত পরিবারে বড় হয়ে উঠি, কীভাবে যেন আত্মকেন্দ্রিকতার পাঠ আমাদের বেশিরভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে যায়। রাজনৈতিক মিছিলে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তাই আমার জীবনে এর পূর্বে ঘটেনি। বরং রাজনীতির মিটিং মিছিলের জগৎটিকে যেন ভিন গ্রহের প্রাণীদের জগৎ জ্ঞান করতাম। তাই মিছিলে যোগ দিতে হবে শুনে এক অজানা অমূলক ত্রাসে খানিকটা আঁতকে উঠেছিলাম। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

ডায়াসে তখন পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য তাঁর অমূল্য বক্তব্য রাখছেন। জানতে পারলাম, মিছিলের মূল অ্যাজেন্ডা প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু হলেও পাশাপাশি স্থান পাচ্ছে আরও কিছু সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের প্রসঙ্গ। যেমন, রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক ঢালাও মদের লাইসেন্স বিতরণ বন্ধের দাবি, সমাজের বুকে পর্বতপ্রমাণ ভার নিয়ে চেপে বসা বেকার সমস্যার সমাধান, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিকার, অশ্লীল কদর্য সংস্কৃতির যে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা চলছে তার অবসান ঘটানোর দাবি, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ এবং পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা বেতন ভাতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার প্রতিবাদ ইত্যাদি নানা জ্বলন্ত সমস্যার প্রতিকারের দাবি।

শীতের দুপুরের মিঠে রোদে দাঁড়িয়ে মেডিক্যাল ফ্রন্টের অতিপ্রিয় সদস্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তৃতা শোনার সুখকর অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে একমাত্র তাঁদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব, জগৎ সংসারে যত রকম সম্পর্ক তৈরি হয়, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক কমরেডশিপ। কমরেডশিপের প্রকৃত অর্থ কী, তার একটা হালকা আভাসমাত্র সেদিন আস্বাদন করলাম।

শুরু হল মিছিল। অভিজ্ঞ পদাতিকেরা স্লোগান তুলছেন, বাকিরা গলা মেলাচ্ছি। এতদিন যাদের সৌম্য, মার্জিত, স্নেহময় রূপ দেখেছি, আজ চাক্ষুষ করলাম তাঁদের উদ্যোগী, প্রতিবাদী সত্তা—

'মুষ্টিবদ্ধ শাণিত হাত আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত,
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র আগুনের শিখার মতো
হাওয়ায় কম্পমান
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকল—
মিছিলের সেই মুখ।'

অবাক চোখে নিরীক্ষণ করতে থাকলাম আমার আশেপাশে হেঁটে চলা মিছিলের মুখগুলি। প্রত্যেকটি মুখে প্রস্ফুটিত একেকটি স্বতন্ত্র জীবনের কাহিনী। কলকাতাবাসী শহুরে মানুষের তুলনায় গ্রামের মানুষের যোগদান তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মনে হল। স্বাভাবিক, দারিদ্রের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, আধুনিক সুযোগসুবিধার বঞ্চনা, সরকারি অপশাসনের কুফলের ভুক্তভোগী তো তাঁরাই সবচেয়ে বেশি। অশিক্ষার বলি হবে তো সর্বাগ্রে তাঁদের ঘরের সন্তান। শহুরে মানুষের মধ্যেও নিম্ন-মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যাই বেশি।

শুনেছিলাম, এস ইউ সি আই (সি)-র মিছিলে মেয়েদের উপস্থিতি খুব প্রমিনেন্ট হয়। সেটা যে এত উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ আকারে, দেখে মেয়ে হিসাবে ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। উদাত্ত জড়তাহীন গলায় স্লোগান দিচ্ছিলেন দলের প্রাজ্ঞ মহিলা কর্মীরা। দেখে বুঝলাম, এঁরা অনেকেই সদ্যযুবতী, বিভিন্ন কলেজের ইউনিয়নের দায়িত্বে রয়েছেন, চোখে মুখে আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিবাদী ভাব। আর আছেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা— পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধে সিদ্ধহস্ত তাঁরা, স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস লড়াকু ভঙ্গিতে স্লোগান দিতে দিতে এগোচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে সমান তালে গলা মিলিয়ে চলেছেন অসংখ্য সাধারণ গ্রাম্য গৃহবধূ, কেউ বাংলা তো কেউ হিন্দিভাষী। বাড়ির কচিকাঁচা, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সপরিবারে অংশগ্রহণ করেছেন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, দার্জিলিং, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু মানুষজন। এঁদের প্রত্যেকের হাবেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানবাত্মার চিরায়ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

'আমরা এসেছি কারা যেন আজ দুহাতে
খুলেছে, ভেঙেছে খিল,
মিছিলে আমরা নিমগ্ন তাই দোলে মিছিল।
দুঃখ-যুগের ধারায় ধারায়
যারা আনে প্রাণ, যারা তা হারায়
তারাই ভরিয়ে তুলেছে সাড়ায় হৃদয়-বিল।
তারাই এসেছে মিছিলে, আজকে চলে মিছিল।'

বাড়ি ফিরে একটু আত্ম-অন্বেষণ করে আবিষ্কার করলাম, আমিও তো মুক্তিপিপাসু এক ক্ষুদ্র প্রাণ। সর্বগ্রাসী পচনশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে মুক্তি খুঁজেছি আমি, যে সংস্কৃতি প্রতি পদে মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করে চলেছে, সামাজিক মানুষকে একেকটি ক্রয়সাপেক্ষ বাজারি পণ্য বানিয়ে ছেড়েছে, পারস্পরিক সহজ সম্পর্কগুলিকে লাভ লোকসানের নিক্তিতে মেপে চলার শিক্ষা দিয়ে মানুষকে অন্তর থেকে সর্বস্বান্ত, একাকী করে দিয়েছে।

আর খুঁজেছি নিষ্ঠুর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দমবন্ধ করা রীতি রেওয়াজ থেকে মুক্তি, যে রীতি রেওয়াজ যুগে যুগে নারীর জীবনকে এক দুর্বিষহ অভিশাপ করে তুলেছে। এর রূপ-আকার-মাত্রা শহুরে এবং গ্রাম্য জীবনে ভিন্ন, উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারে এর প্রকাশের ধরন ভিন্ন, শোষণ-বঞ্চনার অনুভূতিও হয়তো পরিস্থিতি বিশেষে একেকজনের একেকরকম, কিন্তু মুক্তির আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় আমরা সকলেই বোধহয় এক সুতোয় গাঁথা। এই সুতীব্র শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই তো জন্ম নিয়েছে সামাজিক বিপ্লবের স্বপ্ন। হয়তো এই গুরুগম্ভীর মিছিলে এক আনন্দময় প্রাণোচ্ছল ভাইব দিতেই হাজির হয়েছিল আমাদের ভীষণ আদরের তিতলি, উৎসা, প্রদীপ্ত। ফুলের মতো নিষ্পাপ এই কচিকাঁচারা আমাদের সুবিদিত সিনিয়র কমরেডদের সন্তানদল। তাদের এই সবুজের অভিযান আমাদের মিছিলকে রূপলাবণ্য, শ্রী, প্রাণোচ্ছ্বাস দিয়ে অন্য মাত্রায় ঋদ্ধ করেছে। জীবনের উষালগ্ন থেকেই কী সুন্দর সার্বিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে বড় হচ্ছে ওরা। ওরা জীবনপথেও একইরকম নির্ভীক সত্যদৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যাক।

দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে পঞ্চাশ হাজার ছাড়ানো ঐতিহাসিক মহামিছিল। কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিংগুলিতে সারিবদ্ধজনতা ফুলের তোড়া দিয়ে বারংবার আমাদের শীর্ষনেতৃত্বকে অভিনন্দিত করেছেন— প্রকৃত সার্থকতা লাভ করেছি আমরা। জনসমর্থনের চেয়ে বড় প্রাপ্তি তো কোনও রাজনৈতিক মিছিলের হতে পারে না।

হেদুয়া থেকে ধর্মতলার যাত্রাপথে আমার উত্তরণের কথা না বললেই নয়। মিছিলের প্রারম্ভে নিজেকে আকস্মিকভাবে মিছিলে এসে পড়া এক সাধারণ নাগরিক বলে ভাবছিলাম। কিন্তু ক্রমে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সমবেত পদযাত্রার পর পার্টির সঙ্গে অদ্ভুত একাত্মবোধ অনুভব করতে লাগলাম। আমার ধারাভাষ্যেও তাই এই পদযাত্রার উল্লেখ প্রথমে 'এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির মহামিছিল' থেকে শেষে 'আমাদের মিছিল'-এ পরিণত হয়েছে।

মিছিল যত এগিয়েছে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির পাষাণভার যা বুকের ভিতর জমে ছিল, অবিরাম উদাত্ত স্লোগান হয়ে সেই পাথর যেন টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে গেছে মাথার উপর উন্মুক্ত শীত শেষের পরিষ্কার ঘন নীল আকাশে।

ফিনিক্স
সল্টলেক

শিখ গণহত্যা

১৯৮৪ সালের শিখ গণহত্যা প্রসঙ্গে গণদাবীর ৭১ বর্ষ, ২০ সংখ্যায় লেখা আছে রাজীব গান্ধী ওই গণহত্যা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, কোনও মহীরুহের পতন ঘটলে ছোট গাছ চাপা পড়বেই।

শুধু তাই নয়, ওই পৈশাচিক গণহত্যাকে বৈধতা দিতে গিয়ে তিনি দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে কী নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সাংবাদিক খুশবন্ত সিং তাঁর 'লুকিং ফরওয়ার্ড টু চেঞ্জ' বইটিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এ বিষয়ে 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার ০৪.০৯.২০১০ তারিখের খবরের অংশ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলাম ঃ-

'হি (রাজীব গান্ধী) লেট দ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ ডেলহি অর্ডার দ্য পোলিশ নট টু ইন্টারভেন উইথ দ্য হিন্দু মবস থ্রাসটিং ফর শিখ ব্লাড। দ্য রায়োটরস কিল্ড সেভারেল থাউজেন্ডস ইনোসেন্ট শিখ অ্যান্ড লুটেড দেয়ার প্রপার্টি ...'

এতে কি প্রমাণিত হয় না, শুধু সজ্জন কুমারের মতো কিছু আধিকারিকই নন, পুরো কংগ্রেসের শীর্ষনেতারা ওই শিখ গণহত্যা ও দাঙ্গার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল?

রাজীব গান্ধী যখন ওই উক্তিটি করেছিলেন তখন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে। সুতরাং রাজধর্ম পালন করাটা ছিল তাঁর কর্তব্য। কিন্তু এতবড় একটা অন্যায় এবং নিন্দনীয় কাজ করা সত্ত্বেও ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন যা এখনও কেড়ে নেওয়া হয়নি। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

সুবীর সেনগুপ্ত, কলকাতা-২৩

মদবিরোধী আন্দোলন

আমি 'গণদাবী' পত্রিকার একজন পাঠক। ২৫-৩১ জানুয়ারি ২০১৯ সংখ্যার চতুর্থ পাতায় প্রকাশিত 'গ্রামবাসীরা মদ রুখতে জেলায় জেলায় আন্দোলনে'— এই রিপোর্টের বিষয় আমার এই চিঠি।

রিপোর্টে প্রকাশ, ১৬ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ব্লকের পিপুলবেড়িয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহিচাড় গ্রামের গ্রামবাসীরা একটি মদের ঠেক ভাঙলেন। ওই দিন ভোরবেলায় গ্রামের শতাধিক মহিলা একসাথে জড়ো হয়ে মদ বিক্রেতার ভাটি ভেঙে দেন।

'গণদাবী' পত্রিকায় এই রিপোর্ট পড়ে আমার মনে হয়েছে, মদ ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে মহিলাদের আন্দোলন সমগ্র গ্রামবাংলায় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক অন্যতম হাতিয়ার।

কল্লোল রায়, কলকাতা-৩৬

বিমা নির্ভর করে তুলে নাগরিকের স্বাস্থ্যের অধিকার কাড়তে চায় সরকার

'ডিজিটাল ভারতে' অবশেষে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির চিকিৎসা পরিষেবাও 'ডিজিটালাইজড' হল। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, এবছর থেকেই দেশের কমপক্ষে ১০ কোটি পরিবারকে অর্থাৎ কমবেশি ৫০ কোটি মানুষকে এই স্কিমের মাধ্যমে বিনা পয়সায় সমস্ত সাধারণ চিকিৎসা এবং বাছাই করা কিছু জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ, যাঁরা দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে সামান্য কিছু চিকিৎসার সুযোগ পান, অথবা কখনও কখনও একেবারেই বঞ্চিত হন, তাঁদের কেউ কেউ আশান্বিত। কিন্তু ইতিপূর্বে এই ধরনেরই অনেকগুলি স্কিমের আওতায় যাঁরা এসেছেন, সেই ভুক্তভোগীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। তাই বিগত দিনের সরকারি ও বেসরকারি হেলথ স্কিমগুলি, যথা 'আয়ুষ্মান ভারত', 'ন্যাশনাল হেলথ প্রোটেকশন মিশন' ইত্যাদির চুলচেরা বিচার হওয়া দরকার। শাসকরা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ঢাক যতই পেটাক না কেন স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও স্বাস্থ্যকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়নি। অবশ্য সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সেই দায়িত্বটুকুও রাষ্ট্র কীভাবে পালন করে, তার বিচার হওয়া দরকার। কারণ স্বাস্থ্য এমন একটি বিষয় যার সাথে মানুষের জীবনমরণ নির্ভর করে রয়েছে।

প্রথমেই দেখা দরকার, কীভাবে বিভিন্ন জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পণ্যে পরিণত করেছে। কংগ্রেস সরকারের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ১৯৮৩-র মধ্যেই লুকিয়ে ছিল স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বীজটি। ২০০২ সালের দ্বিতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের সিংহদুয়ার খুলে দেয় বিজেপি পরিচালিত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর কংগ্রেসের হাত ধরে ২০০৫-এর গ্রামীণ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ২০০৯ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য বিল সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই ধাপে ধাপে বাণিজ্যিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করা হয়। ২০১৭ সালে আবার বিজেপি সরকার তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার নতুন মডেল তৈরি করেছে। বলা হয়েছে, সমস্ত ভারতবাসীর চিকিৎসা হবে বিনা পয়সায়, কিন্তু বিমা কার্ডের মাধ্যমে। বর্তমানে মোদি সরকার যাকে 'আয়ুষ্মান ভারত হেলথ প্রোটেকশন মিশন' হিসাবে ঘোষণা করেছে। এ ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান কার্ডের বিনিময়ে প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ফ্রি পাবে। এ পর্যন্ত যতগুলি সরকারি বিমা স্কিম চালু ছিল, যেমন আরএসবিওয়াই, সিনিয়র সিটিজেন হেলথ ইনসিওরেন্স স্কিম ইত্যাদি স্কিমগুলি ক্রমশ আয়ুষ্মান ভারতের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অন্যান্য স্কিমের সুযোগ এর পর থেকে আর পাওয়া যাবে না।

বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানে আসলে বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসার অবসান। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য কর্পোরেট হাসপাতাল। যেখানে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য মধ্যবিত্ত জনগণের নেই। ফলে রোগী নামক খরিদ্দার জোগাড় করতে কর্পোরেট মালিকেরা সরকারের সাহায্য চায়। সরকারও সুকৌশলে চালু করে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যবিমা। বর্তমানে যার পোশাকী নাম আয়ুষ্মান ভারত। এর আওতাভুক্ত চিকিৎসার খরচ মেটাবে সরকার। রোগী বেসরকারি হাসপাতালেও ভর্তি হতে পারবেন। সেখানে চিকিৎসার খরচ মেটাবে সরকার। অন্তত ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। স্বভাবতই ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট হাসপাতালে রোগীর ভিড় বাড়বে। সরকারি বদান্যতায় জনগণের টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠবে তাদের স্বাস্থ্যব্যবসা। মানুষের দৃষ্টি এ ভাবে কর্পোরেটমুখী করে দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বড় বড় অংশগুলি কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে— যার কাজ অনেকাংশে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। বিমা কোম্পানিগুলির মুনাফাও এর মধ্যে বেড়ে সহস্র গুণ হবে তা বলাই বাহুল্য।

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমার পরিণতি কী হচ্ছে তা দেখা যাক। আমাদের দেশে কমবেশি ১০ শতাংশ মানুষ বেসরকারি বিমার আওতায় রয়েছেন। আরএসবিওয়াই (রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা) ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসাথীর মতো সরকারি বিমা প্রকল্পের আওতায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলি অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বেসরকারি বিমার হয়রানি নিয়ে কমবেশি অনেকেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেখানে প্রায়শই দেখা যায় কোনও ব্যক্তি যে রোগে ভুগছেন, সেই রোগটিই বিমার আওতায় নেই। থাকলেও তার টাকা ফেরত পেতে জুতোর শুকতলা পর্যন্ত খোয়াতে হয়। আর শুকতলা খোয়ানোর পরও এক তৃতীয়াংশ মানুষ বিমার টাকা ফেরত পান না। আরএসবিওয়াই-র ক্ষেত্রে একবার কেউ ছোটোখাটো অসুখ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে— ১/২ দিনের মধ্যেই ১ লক্ষ টাকার উপরে বিল হয়। এর পরে আর ওই পরিবারের পক্ষে ১ লক্ষ টাকার উপরে বাড়তি টাকা দিয়ে চিকিৎসা করানোর সাধ্য থাকে না। শুরু হয় সরকারি হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ— সেখানে বেড না পেয়ে বহু মানুষকে আজ বিনা চিকিৎসাতেই মরতে দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে আরএসবিওয়াই-এর সুবিধা ক'টি মানুষ পেয়েছেন তা হাতে গুণে বলা যাবে। আজ অধিকাংশ নার্সিংহোমেই এর সুযোগ আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন বিমার জাদু-সম্মোহনে বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যের অধিকারকেই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা!

তা হলে, বিজেপির আয়ুষ্মান ভারতকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে না দেওয়াটা কি তৃণমূল সরকারের কোনও বিপ্লাবত্মক পদক্ষেপ? নাকি কেন্দ্রীয় সরকার যে সব কর্পোরেট হাসপাতালকে ওই বিমার আওতাভুক্ত করেছে সেই তালিকায় তৃণমূল কর্তাদের পছন্দের বহু কর্পোরেট হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের নাম বাদ গেছে বলেই এই হুঙ্কার? মুখ্যমন্ত্রী ফলাও করে বলছেন, ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসাথীর মতো জনমুখী স্বাস্থ্য বিমা তিনি পশ্চিমবঙ্গে চালু করেছেন, যার মাধ্যমে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষজন থেকে নিম্নবিত্ত সকলেই ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। বহু পরিবার ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হাতে পেয়েছেন। যদিও ফ্রি চিকিৎসা কতটা তারা পাচ্ছেন তা প্রশ্নচিহ্নের মুখেই রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বিরোধিতা কি আদৌ স্বাস্থ্যকে বিমানির্ভর হতে না দেওয়ার জন্য?

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৭-তে বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর কথা বলার পরে সর্বপ্রথম তা কার্যকরী করলেন আমাদেরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী— নাম দিলেন 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প'। এতে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি পরিবার ফ্রি চিকিৎসা পাবে এবং চিকিৎসা হবে কর্পোরেট হাসপাতাল ও কিছু নির্বাচিত নার্সিংহোমে। চিকিৎসার টাকা মেটাবে সরকার। দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বাজেটে মৌলিক বিষয়গুলির জন্য যে টাকা আগে বরাদ্দ হত, তা থেকে কেটে নিয়ে মোটা অংশের বরাদ্দ গেছে স্বাস্থ্য বিমার বিল মেটাতে। এর ফলে মানুষ কী সুযোগ পাচ্ছে? আজ যে নার্সিংহোমে চিকিৎসার সুযোগ মিলছে — নিয়মের বেড়াজালে কাল আর সেখানে চিকিৎসা মিলছে না। ফলে সেই একই বিমা, একই তার পরিণতি! কোথাও তার নাম আয়ুষ্মান ভারত, কোথাও স্বাস্থ্যসাথী। ঠিক যেমন ৯০-এর দশকে এ রাজ্যের বড় হাসপাতালগুলিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতি চালু করেছিল তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার, পরবর্তীতে যা জাতীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় ২০০৫ সালে। সুতরাং মুখে যে যত জনমোহিনী কথাই বলুক না কেন, সমস্ত জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই পথপ্রদর্শক, সে সরকারে সিপিএম বা তৃণমূল যেই থাকুক না কেন।

স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী পাঠানো আবার সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা— এ কেমন দ্বিচারিতা! গত এক দশকে এ রাজ্যে তথা গোটা ভারতে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। সরকারি বেসরকারি উভয় জায়গাতেই তা বেড়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, অতিরিক্ত কাজের চাপ, মানসিক ও শারীরিক চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্যানসার, ফুসফুসের নানা রোগ, হার্টের রোগ, নার্ভের রোগ, মানসিক রোগ ইত্যাদি বেড়েছে বহু গুণ। কিন্তু সরকারি পরিষেবার গুণমান কী দাঁড়িয়েছে? সেখানে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীর পদ গত ৩০ বছরে বাড়েনি। নির্ধারিত যে পদ রয়েছে তারও একটা বড় অংশ বরাবরই ফাঁকা থাকে। যেমন বর্তমানে গ্রামীণ স্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নব্বই শতাংশ পদই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। বেডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়ানো হয়নি। যেখানে সারা বিশ্বে ১০০০ মানুষ পিছু ৩.৩টি বেড রয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মাত্র ১.৩টি বেড। ফলে বেডের সাংঘাতিক সংকটের ফলে এক একটি বেডে কোথাও ৩-৪ জন করে রোগী ভর্তি থাকতে বাধ্য হন। এর ফলে চিকিৎসার মান যেমন কমছে তেমনই ভর্তি থাকা রোগীদের ক্রশ ইনফেকশনে ভুগে প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। আর একদিকে ভর্তির সময় বেড সংকটের সুযোগ নিচ্ছে দালাল চক্র। ভর্তি করানো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার তারিখ পাইয়ে দেওয়া, অপারেশনের ডেট এগিয়ে আনার জন্য মানুষ দালাল চক্রের পাল্লায় পড়ে হয়রান হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্লকস্তরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা বাড়েনি। বর্তমানে জনসংখ্যার নিরীখে যেখানে কমপক্ষে ২৩৩৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৭০০টি ব্লকস্তরের হাসপাতাল দরকার সেখানে রয়েছে মাত্র ৯০৪টি এবং ৩৪৭টি। এই স্তরের পরিষেবা বাড়ানোর পরিকল্পনা এবং ঘোষণা বিগত সরকার এবং বর্তমান সরকার কারোরই নেই, যা ছিল স্বাস্থ্যের ভিত। উল্টে এই বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সবরকম সুপারিশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভোটের জনমোহিনী প্রচারের স্বার্থে রাজ্য সরকার জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য জুড়ে অপরিকল্পিতভাবে ৪১টি মাল্টি সুপার হাসপাতাল গড়ে তুলেছে। উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য চিকিৎসক ও লোকবলের অভাবে সেগুলি আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে যথারীতি আগেকার মতোই আজও গ্রামবাংলা থেকে হাজারে হাজারে রোগী কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে রেফার হয়ে যাচ্ছে। আর সেখানে গিয়ে বেড ও পরিকাঠামোর অভাবে কেবলমাত্র জরুরি বিভাগ থেকেই দৈনিক ৪৭৬ জন রোগী ভর্তি হতে না পেরে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ ঘটিবাটি বিক্রি করেও কর্পোরেট হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিচ্ছেন। বাকিরা বিনা চিকিৎসায় মারা যচ্ছেন। পাশাপাশি ওই সব ঝাঁ চকচকে সরকারি মাল্টিসুপার হাসপাতালগুলিকে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবসা করার জন্য কর্পোরেট মালিকর হাতে তুলে দিচ্ছে। যেমন শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি কিছুদিন আগে জিন্দাল গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, সরকারি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অনুপাতে বেড না বাড়লেও বেসরকারি ক্ষেত্রে বেড বেড়েছে অনেক। গত ৭-৮ বছরে সরকারি বেড বেড়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ, কিন্তু বেসরকারি বেড বেড়েছে ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে জনস্বার্থবিরোধী সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য স্বাস্থ্য নিয়ে কর্পোরেট ব্যবসা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। যা বিগত তিন দশকের ধারাবাহিকতাকেও আজ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পূর্বতন সরকার বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োগ করে কলকাতার বাইপাস জুড়ে কর্পোরেট হাসপাতাল তৈরিতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল। আর বর্তমান সরকার জেলা, এমনকী মফঃস্বল শহরে ও স্বাস্থ্য নিয়ে কর্পোরেট ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি পরিষেবাগুলিও পিপিপি নীতিতে কর্পোরেট মালিকদের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদের চরম সংকটের ফলে বেকার ও উপার্জনহীন মানুষের সংখ্যা যখন ক্রমাগত লাফিয়ে বাড়ছে, তখন এই বিপুল সংখ্যক কর্পোরেট হাসপাতালে রোগী নামক খরিদ্দার আসবে কোত্থেকে? সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের সরকারগুলি বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে এই সব কর্পোরেট হাসপাতালে খরিদ্দারের জোগান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হলে আজ আপামর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া পথ নেই।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কাশ্মীরে সিআরপিএফ হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে
কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

কাশ্মীরে সিআরপিএফ সেনাদের হত্যাকাণ্ডের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ভারত সরকার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের দায়ী করেছে। এ কথা সকলেরই জানা যে, ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই তালিবান, আল কায়েদা, আইসিস, জৈশ মহম্মদ ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে নিজস্ব স্বার্থে মদত দিয়ে গড়ে তুলেছে। আবার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিও নিজেদের স্বার্থে কোনও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তাকে সন্ত্রাসবাদীদের কাজ বলে অভিহিত করছে।

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র ধিক্কার জানিয়েও জনমানসে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, ভারত সরকার যখন কাশ্মীরকে বাস্তবে রাষ্ট্রপতি শাসন ও সামরিক শাসনের আওতায় রেখেছে, তখন সেখানে এই ঘটনা ঘটতে পারল কী করে। এই প্রশ্নে কি ভারত সরকার নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? আরও প্রশ্ন উঠছে যে, দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা পূর্ণাঙ্গ রূপে কার্যকর না করে কাশ্মীরী জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে উপেক্ষা করে যেভাবে দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে, ভুয়ো সংঘর্ষ দেখিয়ে নিরীহদের হত্যা করা হচ্ছে, পেলেট বন্দুক ব্যবহার করে বহুজনকে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, যুবকদের গুমখুন করা হচ্ছে, যার সংবাদ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেই বহুবার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, কাশ্মীরের জনগণের মধ্যেও তীব্র ভারত সরকারবিরোধী মানসিকতা গড়ে উঠেছে, যাকেই দেশ-বিদেশের নানা মতলববাজ শক্তি ব্যবহার করছে।

আমরা মনে করি, সামরিক শাসন ও দমন-পীড়ন নয়, একমাত্র শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার দ্বারা কাশ্মীরের জনগণের আস্থা অর্জন করে কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়সঙ্গত এবং স্থায়ী সমাধান করার পথ গ্রহণ করতে হবে। পুলওয়ামার হত্যাকাণ্ডকে ভিত্তি করে দেশে উগ্র জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় ইন্ধন দিয়ে তাকে নির্বাচনী স্বার্থে কাজে লাগানোর বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য আমরা জনগণের কাছে আবেদন করছি।

বন্ধ চটকল খোলা, স্থায়ীকরণ, ন্যায্য মজুরির দাবিতে
চটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

চটশিল্পের সাথে যুক্ত ২১টি ইউনিয়ন আগামী ১ মার্চ থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কেন এই ধর্মঘট? ২০১৫-র ত্রিপাক্ষিক চুক্তির তিন বছর মেয়াদ শেষ হবার পর ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে ২২ দফা দাবিসনদ পেশ করেছিল, এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও সেই দাবিসনদের কোনও মীমাংসা হয়নি। কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল কোনও সরকারই দাবিসনদ মীমাংসার ক্ষেত্রে কোনও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি সরকারের এই উদাসীনতা এবং নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে মুনাফালোভী চটকল মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত দাবিগুলি উপেক্ষা করে যাচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের আটটি চটকলে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' জারি করে মিলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কারখানাগুলিতে প্রায় এক বছর যাবৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পরিণতিতে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক পরিবার অর্ধাহার, অনাহারে সন্তান সন্ততিদের নিয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চটকলগুলি খুলে উৎপাদন শুরু করার ব্যাপারে সরকার মালিকদের উপর কোনও চাপই দিচ্ছে না।

বাস্তবে সরকার মালিকদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করছে। মালিকদের খুশি করতে ২০০২ সালে সিপিএম সরকার কালাচুক্তি করে শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ১৭২ টাকা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকা করে দিয়েছিল। উৎপাদনভিত্তিক মজুরিনীতি চালু করে বাস্তবে বেতন কাটার ব্যবস্থা করেছিল যা শ্রমিক মহলে 'কাটৌতি' নামে পরিচিত। মালিকরা সে সময় শ্রমিকদের চার বছরের বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার টাকা লুট করেছে। এ ছাড়া পিএফ, ইএসআই এবং গ্রাচুইটির প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। শ্রমিক ছাঁটাই এবং গেটবাহার চলেছে। বর্তমানে শ্রমিকদের পার্মানেন্ট না করে আজীবন বদলি এবং কন্ট্রাক্ট হিসাবে রেখে দিচ্ছে মালিকরা। বদলিতে ভর্তি হয়ে বদলি হিসাবেই অবসর নিচ্ছে— এর ফলে সামাজিক সুরক্ষা এবং বহু আইনি সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। চটকলের শ্রমিকদের কোয়ার্টারগুলি কুখ্যাত কুলিলাইন হিসাবে। আলোবাতাসহীন এক চিলতে ঘর, না আছে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা, না আছে পর্যাপ্ত শৌচাগার। শ্রমিকদের মনুষ্যেতর জীব হিসাবে গণ্য করে মালিকরা। এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি হল জীবনধারণ এবং বসবাসের উপযুক্ত কোয়ার্টার শ্রমিকদের থাকার জন্য দিতে হবে। এই অবস্থায় চটশিল্পের শ্রমিকরা বাধ্য হয়েছে ধর্মঘটের পথে যেতে। এবারের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের মূল দাবিগুলি হল— আটটি বন্ধ চটকল খোলা, মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা, পেনশন মাসে ৬০০০ টাকা করা, প্রতিটি কারখানায় ৯০ শতাংশ পার্মানেন্ট এবং ২০ শতাংশ স্পেশাল বদলি শ্রমিক রাখা ইত্যাদি।

এই দাবিগুলি সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক দাবি। অথচ এগুলি পূরণ করা নিয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের দীর্ঘ টালবাহানা চলছে। এই অবস্থায় প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ, আপসহীন, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলা। চটকল শ্রমিকদের লড়াই ও আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে ৮৪ দিন পর্যন্ত একটানা ধর্মঘটের নজির সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। ৮-৯ জানুয়ারির সারা ভারত ধর্মঘটেও চটশিল্পের শ্রমিকরা সর্বাত্মকভাবে অংশ নিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি কারখানায় আন্দোলনের হাতিয়ার 'শ্রমিক কমিটি' বা 'স্ট্রাইক কমিটি' গড়ে তুলতে হবে। এই স্ট্রাইক কমিটিগুলির অনুমোদন ব্যতীত কোনও পরিস্থিতিতেই ধর্মঘট তুলে নেওয়া যাবে না। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চটকল শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত হচ্ছে। ফলে প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ, আপসহীন, দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হবে। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই ধর্মঘট সফল করার জন্য চটকল শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছে।

মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

তমলুকের হোগলবেড়িয়া গ্রামে একই এলাকায় তিনটি সরকারি মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ দেখান। পরে একটি সুসজ্জিত মিছিল রামতারক হাট এলাকা পরিক্রমা করে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম মাইতি, অমিয় মাল, বিজয় মল্লিক, পদ্মলোচন গোস্বামী প্রমুখ। দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক অশোক মাইতি বলেন, জনসাধারণের দাবিকে উপেক্ষা করে মদের দোকান খুলতে এলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে তা রুখব। (ছবি ৩-এর পাতায়)

এমএসএস-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

তিন শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বহরমপুর গ্রান্ট হলে। রাজ্য সভানেত্রী কমরেড হাসি হোড় রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। তিনি ছাড়াও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী এবং জেলা সভানেত্রী কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার। জেলা সভানেত্রী মূল প্রস্তাব পাঠ করেন। সমর্থনে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা, নারী নির্যাতন বন্ধ ও প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড অনুপা তেওয়ারীকে সভানেত্রী ও কমরেড পর্ণা চক্রবর্তীকে সম্পাদিকা করে ২৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

৯-১০ মার্চ কনভেনশন ও রাজ্য সম্মেলনের জন্য দেওয়াল লিখছেন এ আই এম এস এস কর্মীরা

চেন্নাইয়ে যুব বিক্ষোভ

ক্রমবর্ধমান বেকারির প্রতিবাদে ৮ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ে বিক্ষোভ দেখায় এ আই ডি ওয়াই ও। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন চেন্নাই জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদক এস শিবকুমার। সভা থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান সহ নানা দাবিতে স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com